

५५

का०

१०

अष्टमप्रवचने



अहिल्याबाई

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকর্তার নূতন শিক্ষা-ধারা অনুসারে বিদ্যালয়সমূহের
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর উপপাঠ্যরূপে লিখিত

আর্য্যলক্ষ্মী—১২নং



শ্রীমতী সুধা দেবী
প্রণীত

দেব

সাহিত্য

কুটীর

প্রকাশ করেছেন—

শ্রীম্‌বোধচন্দ্র মজুমদার

দেব সাহিত্য-কুটার

২২।৫বি, বামাপুকুর লেন.

কলিকাতা—৯

পুনর্মুদ্রণ—

শ্রাবণ

১৩৬১

ছেপেছেন—

এস্. সি. মজুমদার

দেব-প্রেস

২৪, বামাপুকুর লেন

কলিকাতা—৯

দাম—

ছয় আনা

অহল্যা বাঈ

৬৬

“ঠাকুর মশাই ! আমার হাতটা গুণে দেখুন ত ।”

বেলা প্রায় শেষ । মহারাষ্ট্র দেশের বর্তমান আহমেদনগর জেলার পাথরডি গ্রামে একজন জ্যোতিষী এসে বেশ আসর জমিয়ে বসেছেন । গ্রামের মেয়ে-পুরুষ অনেকেই ঠাকুর মশায়ের কাছে হাত দেখিয়ে সন্তুষ্ট-চিত্তে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে ।—কারো একটা পাথরের বাটি হারিয়েছে, কারো গরুটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কারো ছেলেপুলে হয় না, কারো চাকরী কবে হবে ! কারো স্বামী বিদেশে আছে, চিঠিপত্র অনেকদিন থেকে আসছে না, কেমন আছে ? কারো মোকদ্দমায় হার হবে কি জিৎ হবে,—ইত্যাদি সব আরো কত কি গণৎকার ঠাকুর চটপট জবাব দিয়ে দিচ্ছেন । লোকেরা ভারী খুশী ।

একটি ছোট্ট মেয়ে,—বয়স বছর পাঁচ ছ’ হবে, ধুলোমাটি নিয়ে খেলা করছিল, তাড়াতাড়ি কাপড়ে হাত মুছে ছুটে এসে গণৎকার ঠাকুরের কাছে হাতখানা ধুলে দিয়ে একগাল হাসি হেসে বলে,—“ঠাকুর মশাই ! আমার হাতটা গুণে দেখুন ত ।”

বালিকার কথায় ঠাকুর কাণ দিলেন না ।—একজন লোকের গাছের একটা কাঁটাল চুরি গেছে, তিনি সেই চোরের সন্ধান করতে ব্যস্ত ।

বালিকা আবার বল্লে,—“দেখুন না ঠাকুর মশাই !”

ঠাকুর মাটিতে খড়ির দাগ কাটতে কাটতে বালিকার হাতখানা সরিয়ে দিয়ে বল্লে, “হ্যাঁ, তুমি রাজরাণী হবে।”

সকলে হো হো ক’রে হেসে উঠলো। তার সমবয়সী ছ’ একজন মেয়ে ঠাট্টা ক’রে বলতে লাগলো—“অহল্যা, তুই রাজরাণী হবি।”

গণৎকারের অবজ্ঞা এবং সকলের বিদ্রূপ বালিকার প্রাণে বড় ব্যথা দিল। সে আর চোখের জল রাখতে পারলো না, ঝর ঝর ক’রে কেঁদে ফেল্লে।

এক বৃদ্ধার বড় দয়া হ’লো। সে বালিকাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর ক’রে তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বল্লে,—“কেঁদো না মা, আমি ঠাকুর মশাইকে বল্ছি, তিনি তোমার হাত দেখবেন ‘খন।”

বালিকা শান্ত হ’লো।

বৃদ্ধার অনুরোধে গণৎকার ঠাকুর বালিকার বাঁ হাতখানা খুলে ধ’রেই অবাক হ’য়ে তার মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

তারপর বালিকার হাতখানা ভাল ক’রে মুছে নিয়ে অনেকক্ষণ ধ’রে দেখে আবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এতক্ষণ ধ’রে ঠাকুর মশাই ঐটুকুন মেয়ের হাত অমন মনোযোগ দিয়ে দেখুচ্ছেন দেখে অনেকের কেমন মনে হ’তে লাগলো।...

সে বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলে,—“কি দেখুচ্ছেন ঠাকুর মশাই ?”

ঠাকুর মশাই নীরব,—কেবল বালিকার হাতের দিকে আর মুখের দিকে দেখুচ্ছেন।

অনেকক্ষণ পরে বল্লে,—“দেখুছি ?—এ মেয়েটি কার ?”

বৃদ্ধা বল্লে,—“এই গ্রামের আনন্দ রাও সিন্ধের মেয়ে, নাম অহল্যা,—

ভারী লক্ষ্মী মেয়েটি!”—এই ব’লে সে বালিকার কপালের উপর এসে-পড়া থোকা থোকা ঢুলগুলো সরিয়ে দিতে লাগলো।

গণৎকার ঠাকুর বল্লেন,—“শুধু লক্ষ্মী নয়, রাজলক্ষ্মী!” তারপর আরো কিছুক্ষণ হাতখানা নেড়ে-ঢেড়ে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, “এর বাবা কি বড়লোক?”

বুঝা বল্লে,—“এক কালে অবস্থা ছিল খুব ভালো। এখন বড় গরীব। সামান্য একটু জমী আছে। তাই চাষবাস ক’রে কোনো রকমে দিন কাটে।”

গণৎকার বল্লেন,—“আমার মুখ দিয়ে প্রথমেই যে কথা বেরিয়েছে, তাই দেখছি ঠিক, এ মেয়ে নিশ্চয় রাজরাণী হবে।”

সকলে শুনে অবাক হ’য়ে গেল।

বুঝার আনন্দের সীমা নাই। সে অহল্যাকে কোলে নিয়ে তাড়াতাড়ি আনন্দ রাও-এর বাড়ী ছুটে গিয়ে তাঁকে এবং তাঁর পত্নীকে গণৎকারের ভবিষ্যৎ-বাণী শোনালো।

অহল্যা তাঁদের এই সবে ধন একটি মেয়ে,—কোনো পুত্র সন্তান নাই।...মেয়ের ভবিষ্যৎ গোরবের আনন্দে মা-বাপের রুকে আর আনন্দ ধরে না। আনন্দ রাও মেয়েকে কোলে নিয়ে দুমু খেয়ে বল্লেন,—“ভগবান্ করুন, গণৎকার ঠাকুরের কথা যেন সফল হয়।”

অহল্যার মা গলায় আঁচল জড়িয়ে মনে মনে কুলদেবতাকে প্রণাম ক’রে বল্লেন, “ঠাকুর! গণৎকারের কথা যেন সত্যি হয়।”

অহল্যার কিন্তু মনে হ’তে লাগলো,—তার মা-বাবা অবধি তাকে ঠাট্টা করছেন—কেন সে হাত দেখাতে গিয়েছিল, না গেলেই পারতো।

দুই

গরীবের মেয়ে অহল্যা। কিন্তু তার মনটা ছিল বড় উঁচু।...অনেক বড় ঘরের মেয়েরও তা দেখা যায় না! গরীব ছুঃখীর প্রতি তার ছিল অসীম দয়া। ভিখারী দেখলে খেলাধুলা ফেলে সে ছুটে আসতো—তাদের নিজ হাতে মুঠো মুঠো ঢাল দিতে। দান ক’রে মেয়ে সুখী, তাই মা-বাপ কিছু বলতেন না। বরং ভিখারীদের “রাজরাণী হও মা” আশীর্বাদে তাঁদের প্রাণ স্বর্গের আনন্দে ভ’রে উঠতো।

ব্রত ও পূজা-পার্বণে বালিকার আগ্রহ ও আনন্দ কত! সকালে উঠে ফুল তোলা, ঠাকুর ঘর পরিষ্কার করা, চন্দন ঘষা, পূজার আয়োজন করা—এতে ছিল অহল্যার নিজস্ব অধিকার, এতে কারো হাত দেওয়ার জো ছিল না।

আবার পড়াশুনা এবং গৃহের কার্যেও তেমনি—যেন মূর্তিমতী লক্ষ্মীটি!

‘রাজরাণী’ কথা মনে পড়লেই আমাদের মনে হয় যেন এক অনিন্দ্য-রূপসী, কুঁচবরণ কন্যা, মেঘবরণ ঢুল। কিন্তু অহল্যা তেমন রূপসী ছিল না, তবে তার দেহের প্রতি ভাঁজে ভাঁজে ছিল পরম সুন্দর চোখ-ভুলানো একটি অপূর্ণ লক্ষ্মী-শ্রী,—যা অনেক ছুধে-আলতা বরণা রূপসীরও থাকে না।

তার ঢালঢলন, তার খেলা, তার হাসি, তার কথা,—সমস্তের মধ্যে সুন্দর মনোরম হ’য়ে ফুটে উঠতো তার লক্ষ্মী-শ্রী—রাজরাজেশ্বরী রূপ!

তিন

প্রায় তিন বছরের পরে, গ্রীষ্মের এক অপরাহ্নে—

পাথরডি গ্রামের মাক্ৰতি দেবীর মন্দিরের স্তম্ভে খোলা মাঠে সারি সারি তাঁরু পড়েছে। হাতী ঘোড়ার ডাক ও সৈন্যের কোলাহলে স্থানটি গম্ গম্ করছে। নীরব নিস্তব্ধ গ্রামখানা সহসা এত লোকজনের আগমনে যেন প্রাণ পেয়ে নৃতন শক্তিতে সজীব হ'য়ে উঠেছে।

গ্রামবাসীরা শুনলো, ইন্দোরের মহারাজ মলহার রাও হোলকার সৈন্যে কোথায় যাচ্ছিলেন, সন্ধ্যা হয় দেখে রাত্রির বিশ্রামের জন্য সেখানে তাঁরু ফেলেছেন।

রাজা এসেছেন তাদের গ্রামে,—তাদেরি দেশের রাজা। বহু পুণ্যফলে রাজদর্শন ঘটে। পরদিন ভোর হ'তে না হ'তেই গ্রামবাসীরা দলে দলে যার যা' সাধ্য উপহার নিয়ে রাজদর্শনে ছুটলো। কিন্তু গেলেই ত আর রাজার সঙ্গে দেখা করা যায় না! রাজার অনুমতি চাই।

মলহার রাও যখন শুনলেন, ঐ গ্রামের তাঁর প্রজারা তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এসেছে, তখন সাগ্রহে তিনি সম্মতি দিলেন।

মাক্ৰতি দেবীর মন্দিরের স্তম্ভের নাটমন্দিরে রাজার সঙ্গে দেখা করবার স্থান হ'লো। রাজা ব'সেছেন, তাঁর চারপাশে গ্রামের সব গণ্যমান্য লোকেরা ব'সেছেন, তারপর সাধারণ লোকের স্থান।

মহারাজ মলহার রাও হাসি মুখে প্রজাদের সঙ্গে কথা কইছেন। তা'দের সুখদুঃখের কথা শুনছেন। যা' প্রতিকার করা সম্ভব, তা'র আদেশ দিচ্ছেন।

অহল্যাও শুনলেন, তাঁদের দেশের রাজা এসেছেন তাঁদের গ্রামে, তা' আবার বাড়ীর একেবারে কাছে, মাক্‌তি দেবীর মন্দিরে। রাজরাণীর গল্প অহল্যা অনেক শুনেছেন, কিন্তু রাজা কেমন কখনো চোখে দেখেন নি। তাঁরো বড় আগ্রহ হ'লো, রাজা কেমন দেখতে। ছেলেমেয়েরা অনেকেই দলে দলে মাক্‌তি দেবীর মন্দিরে যাচ্ছে। অহল্যাও তা'দের সঙ্গে চলে, ...না বেশ-ভূষার পারিপাট্য, না কিছু।

দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে তিনি রাজাকে দেখলেন! কিন্তু কথাবাণী ত শুনলেন না! রাজা কেমন ক'রে কথা কন তা' শোনবার জন্যে অহল্যার আগ্রহ হ'লো। ...অহল্যা দূর থেকে দেখলেন। রাজার কাছে যারা ব'সে আছেন, তাঁদের মধ্যে ছ'একজন তাঁর বেশ পরিচিত। বিশেষতঃ তাঁদের পাঠশালার পণ্ডিত মশাই!

অহল্যা পণ্ডিত মশায়ের বড় আদরের ছাত্রী। পড়াশুনায় এবং চরিত্রের মধুরতায় বালিকা বৃদ্ধ গুরু মশায়ের মনটি অধিকার করে নিয়েছিলেন। তাঁকে রাজার কাছে দেখে অহল্যার ভয় সঙ্কোচ যেন সব নিমিষে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। তিনি নির্ভয়ে ধীরে ধীরে পা ফেলে গুরু মশায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

অতবড় সভার মধ্যে একটি বালিকাকে অমন নির্ভয়ে এসে দাঁড়াতে দেখে রাজার ভারী কোতূহল হ'লো। তারপর বালিকার চাউনিতে এমন সুন্দর একটা কমণীয় জ্যোতিঃ এবং মুখে এমন একটা রমণীয় লক্ষ্মী-শ্রী ফুটে উঠেছিল যে, রাজা সত্যি সত্যি তা' দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

মলহার রাও তাঁকে কাছে ডাকলেন। অহল্যা ধীরে ধীরে নির্ভয়ে গিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে ছ'হাত জোড় ক'রে নমস্কার করলেন।

মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কার মেয়ে মা, কি নাম তোমার?”

অহল্যা অতি বিনয়ের সঙ্গে উত্তর করলেন,—“আমি পূজনীয় আনন্দ রাও সিন্ধে মশায়ের কন্যা, নাম অহল্যা।” কে যেন মধুর স্বরে বীণা বাজিয়ে গেল। রাজা শুনে মুগ্ধ হ’লেন।

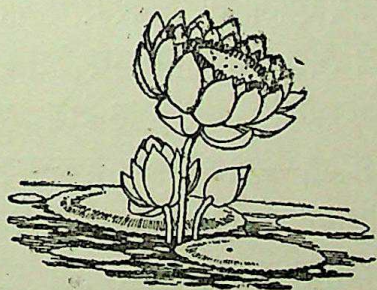
সভার যঁারা অহল্যাকে চিনতেন, তাঁরা সবাই রাজার কাছে তাঁর গুণের প্রশংসা করলেন। এক গণকর ঠাকুর যে, তাঁর হাত দেখে বলেছিলেন, অহল্যা রাজরাণী হবেন,—এ কথাও তাঁরা ব’লে ফেলেন।

অহল্যার গুণের কথা শুনে এবং তাঁর লক্ষ্মী-শ্রী দেখে রাজা ভারী খুশী হ’লেন। অনেকক্ষণ তিনি বালিকার দিকে চেয়ে রইলেন, কি ভাবলেন, তিনিই জানেন।

তারপর তিনি মেয়েটির হাতে কিছু ভাল ভাল খাবার দিয়ে বল্লেন,—“আচ্ছা মা, এবার যাও।”

অহল্যা মহারাজের দেওয়া খাবার নিয়ে হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে মায়ের কাছে এসে সব কথা বল্লেন। মা শুনে অবাক হ’য়ে বল্লেন,—“সে কি রে? তুই মহারাজের কাছে গিয়েছিলি?”

বালিকার যেন মনে হ’ছিল,—মহারাজের কাছে যাওয়া কি একটা এমন ভারী শক্ত কাজ? অনেকেই ত গিয়েছে। সে সরল সহজ ভাবে উত্তর দিল,—“হ্যাঁ, মা!”



চার

মলহার রাও চ'লে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত সৈন্যও গেল। পাথরডি আবার যেই নীরব নিস্তন্ধ,—সেই নীরব নিস্তন্ধ হ'লো। কিন্তু আনন্দ রাও-এর কন্যা অহল্যাকে মহারাজ যে ভাবে আদর করলেন, সে কথা নিয়ে আলোচনার বিরাম হ'লো না।

আনন্দ রাও আর তাঁর পত্নী তাঁদের মেয়ের উপর মহারাজের অনুগ্রহের কথা ভাবেন, আর আনন্দে ও গর্বে তাঁদের বুক ভ'রে ওঠে।

কিছুদিন যায়।—একদিন ইন্দোরের দূত পাথরডি গ্রামে এসে এক অসম্ভব শুভ সংবাদ ঘোষণা করলো। সবাই শুনে অবাক হয়ে গেল,—মহারাজ মলহার রাও হোলকার বাহাদুরের পুত্র কুমার খাওরাও-এর সঙ্গে সামান্য কৃষক আনন্দ রাও-এর কন্যা অহল্যার বিয়ে!

সকলের মনে পড়লো, সেই গণৎকার ঠাকুরের সেই ভবিষ্যৎ-বাণী,—এ মেয়ে রাজরাণী হবে।

আনন্দ রাও এবং তাঁর স্ত্রীর আর আনন্দ ধরে না। তাঁদের আদরের অহল্যা ইন্দোরের রাজপুত্রবধূ হবে। জগতে ক'জন মাতাপিতা কন্যা হ'তে এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। সঙ্গে সঙ্গে আবার তাঁদের মনটা কন্যার আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় কেঁদে উঠলো।

অহল্যা সখীদের কাছে শুনলেন, তিনি রাজরাণী হ'তে চলেছেন। শুনে তাঁর এতটুকু আনন্দ হ'লো না, বরং বাপ-মাকে ছেড়ে স্বশুর ঘরে যেতে হবে, এ দুঃখ যেন তাঁর অসহনীয় ঠেকছিল।

এক শুভদিনে রাজকুমার খাওরাও-এর সঙ্গে অহল্যার বিয়ে হ'লো। রাজপুত্রের বিয়ে,—ধুমধাম, জাঁকজমকের কোন ত্রুটি হ'লো না। কত বাজনা বাজলো, কত বাজি পুড়লো, কত আলো জ্বললো,—কত হাতী-ঘোড়া, লোক-লস্কর, বরকন্দাজ, পাল্কী—কত কি!

কুটীরবাসিনী গরীব কৃষক কন্যা অহল্যা ইন্দোরের রাজপুত্রবধু হ'লেন। বয়স তাঁর সবে তখন নয় বছর। কত ঐশ্বর্যের আড়ম্বর তাঁর চারদিকে, কত দাসদাসী তাঁর হুকুম তামিল করার জন্য ব্যস্ত, কত হীরামুক্তা জহরতের গয়না তাঁর গায়, কি প্রকাণ্ড গম্গমে রাজপুরী,—কি সুন্দর সাজানো ঘর-দুয়ার, খাওয়ার জিনিষই বা কত রকম,—রাজরাণীর আদরের অন্ত নাই।

অহল্যা রূপকথায় কতশত রাজরাণীর গল্প শুনেছেন। কিন্তু এত যে তাদের ঐশ্বর্য তা' তাঁর অতটুকু কল্পনায় আসে নাই। তাঁর জীবনটা যেন মুহূর্তে সব ওলোট-পালোট হ'য়ে গেল।

অহল্যা হঠাৎ এতবড় একটা পরিবর্তনের মধ্যে এসে পড়লেন বাটে, কিন্তু তাঁর মনের কোনো পরিবর্তনই ঘটলো না। গরীবের ঘর থেকে একেবারে ইন্দোরের রাজপুত্রবধু—কতবড় সৌভাগ্য, কতবড় পরিবর্তন! কিন্তু সেজন্য তাঁর মনে এতটুকু অহঙ্কার হ'লো না।

দাস-দাসীরা ছুপি ছুপি বলাবলি করতে লাগলো, আমাদেরই মত গরীবের ঘরের মেয়ে তো, রাজরাজড়ার ঢাল-ঢলন জানবে কোথেকে।

মহারানী গৌতমা বাঈও পুত্রের জন্য অমন একটা গরীবের ঘরের মেয়ে আনবার জন্য মনে মনে স্বামীর উপর একটু অসন্তুষ্ট ছিলেন। মহারাজ তাঁর মনের ভাব বুঝে বলেন,—“গরীবের মেয়ে হ'লে কি হয়? আমি একটি রত্ন এনেছি,—এর মধ্যে যে সব গুণ আছে, রাজা মহারাজের ঘরেও তা' নেই!—ক্রমেই বুঝাতে পারবে মহারানী, আমি ভুল করিনি।”

অল্পদিনের মধ্যেই গৌতমা বাঈ-এর ভুল কেটে গেল। বালিকা পুত্রবধুর সেবাসুশ্রদ্ধা এবং স্বভাব-চরিত্রে তিনি একেবারে মোহিত ও আহ্বারা হ'য়ে পড়লেন।

অহল্যা শ্বশুর ঘরে এসে দেখলেন, এ সংসারে আর তাঁর বাপের বাড়ীর সংসারে ঢের তফাৎ,—আকাশ আর পাতাল বল্লেও যেন ঠিক বলা হয় না। এখানে দাস-দাসী ঢের, খরচের অন্ত নাই, অথচ যেন সব অগোছালো, রাজ-সংসারের ভালমন্দের দিকে দাস-দাসীর লক্ষ্য নাই। এ সব অহল্যার মোটেই ভাল লাগলো না, তিনি দেখলেন, একটু চেষ্টা করলেই এ সংসারটিকে দিকি সুন্দর গুছিয়ে নেওয়া যায়, তাতে খরচ বাঁচবে ঢের, অথচ কাজ পাওয়া যাবে অনেক বেশী।

অহল্যা নিজের মধুর চরিত্রের গুণে শ্বশুর-শাশুড়ীকে বশ ক'রে নিয়ে সংসার গোছাতে মন দিলেন। দাসদাসীদের হুঁসিয়ার ক'রে দেওয়া এবং সংসারের বাজে খরচ কমিয়ে দেওয়াই হ'লো তাঁর এখন প্রধান কাজ।

যেখানে দাস-দাসীদের কাজের কোনো ত্রুটি হ'তো, সেখানেই অহল্যার হাত গিয়ে পড়তো, কিন্তু তাদের তিনি একটু কটু কথাও না ব'লে নিজ হাতে ত্রুটি সেরে নিতেন। এতে দাস-দাসীরা সকল সময় সন্তুষ্ট হ'য়ে কাজ করতো—যেন বৌ-রাণীর কাছে লজ্জা পেতে না হয়। রাজারাণী পুত্রবধূকে সংসারের সাধারণ কাজ করতে দেখে, অনেক সময় মৃদুমধুর তিরস্কার করতেন, কিন্তু অহল্যা হাসিমুখে বলতেন,—“আমার সংসারের কাজ আমি করছি, এতে দোষ কি?—ওরা ত সব কাজ গুছিয়ে করতে পারে না।”

অহল্যার হাতের স্বর্ণে রাজ-সংসারের নূতন শ্রী ফুটে উঠলো। পুত্রবধূর পরামর্শে মলহার রাও অনেক বাজে খরচ কমিয়ে দিলেন।

সেই টাকা গরীব-দুঃখীর জন্য ব্যয় হ'তে লাগলো। দান-দরিদ্রেরা বো-রাণীকে ছ'হাত তুলে আশীর্বাদ করতে লাগলো। অল্পদিনের মধ্যে অহল্যার গুণগানে ইন্দোর রাজ্য মুখরিত হ'য়ে উঠলো। রাজা-রাণীর মনে আর আনন্দ ধরে না।

মলহার রাও রাণীকে একদিন বল্লেন,—“দেখলে রাণী, গরীবের ঘরের মেয়ে এনে আমি ভুল করিনি, বরং রাজ্যের রাজলক্ষ্মী ঘরে এনেছি।”

মলহার রাও অনেক সময় ঐ বুদ্ধিমতী পুত্রবধূটির পরামর্শ নিয়ে রাজ্যের অনেক কাজ করতেন। তাতে ফল ভালো ছাড়া কখনো মন্দ হয়নি। শেষে এমন হ'য়ে দাঁড়ালো যে, বড় বড় গুরুতর কার্য্যও মলহার রাও অহল্যার পরামর্শ না নিয়ে করতেন না। এমনি ক'রে গরীবের ঘরের মেয়েটি ইন্দোর রাজ-ভবনের সর্ব্বেসর্বা হ'য়ে উঠলেন।



ছয়

বিয়ের পর বড় সুখে কয়েকটা বছর কেটে গেল। কিন্তু ভগবান্‌
রুক্ষি মানুষের কপালে চিরসুখ লিখেননি। হঠাৎ অহল্যার জীবনের
সুখের প্রদীপও একটা দম্কা হাওয়ায় নিভে গেল। দুর্দান্ত জাঠদিগের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে স্বামী খাওরাও-এর মৃত্যু হ'লো। একটি
ছেলে ও একটি মেয়ে নিয়ে আঠারো বছর বয়সে অহল্যা বিধবা হ'লেন।

স্বামীর মৃত্যুতে অহল্যা সংসার অন্ধকার দেখতে লাগলেন। সংসারে
স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র সুখের সামগ্রী—একমাত্র অবলম্বন! বিধবা
হ'য়ে থাকা না থাকা সমান। তাই অহল্যা স্বামীর সঙ্গে এক চিতায়
পু'ড়ে মরবেন স্থির করলেন। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ীর একান্ত অনুরোধে
তঁার মরা হ'লো না।

অহল্যাকে নানা কাজে জড়িয়ে রেখে স্বামীর চিন্তা থেকে অনেকটা
দূরে রাখবার জন্যে মলহার রাও রাজ্যের অনেক ভার তাঁর হাতে ছেড়ে
দিলেন। অতবড় রাজ্যের ভার পেয়ে অহল্যা বিচলিত হ'লেন না।
অতি সুন্দররূপে রাজকার্য্য চালাতে লাগলেন। কর্ম্মচারীদের দোষত্রুটি
ও ভুলভ্রান্তি তিনি এমন ক'রে ধ'রে দিতে লাগলেন যে, তাদের আর
সাহসে কুলোত না—কোন রকম অগ্নায় কিছু করতে। অহল্যা বাই
ধীরে ধীরে রাজ্যশাসনে দিক্‌শি পাকা হ'য়ে উঠলেন।

বিধবা হওয়ার পর শ্বশুরের সহায়তায় প্রায় বারো বছর অহল্যা বাই
রাজ্য পরিচালনা করলেন। তারপরেই শ্বশুরের মৃত্যু হওয়ায় রাজ্যের
সমুদয় ভার তাঁর উপর এসে পড়লো।

অহল্যার পুত্র মালেরাও তখন নাবালক, কাজেই পুত্রের নামে তিনিই হিন্দোর রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। মালেরাও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বড়ই হৃদান্ত ও নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠতে আরম্ভ করলেন। তারপর যখন বুঝতে পারলেন, অত বড় রাজ্যের তিনিই মালিক, তখন তাঁর নিষ্ঠুরতা আরও চরমে উঠলো।

অহল্যা বাঈ দানধ্যান, ব্রত ও পূজাপার্বণ রীতিমত করতেন। অর্থব্যয়ও তাতে প্রচুর হতো। ধর্ম-কার্যে অহল্যা ছিলেন মুক্তহস্ত, কোনো রকম কপণতা তাতে তাঁর ছিল না।

কিন্তু মালেরাও এসব মোটেই দেখতে পারতেন না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বা দীন হুংখী দেখলেই তিনি জ্বলে উঠতেন। আর তাদের ধ'রে নিয়ে গিয়ে কত রকম শাস্তি সাজাই না দিতেন।



মা ব্রাহ্মণদের দান করবার জন্য কাপড়-চোপড় জামা-জুতো অনেক কিনে এনেছেন দেখলেই মালেরাও-এর মাথায় এসে শয়তানী বুদ্ধি ঢুকতো। তিনি গোপনে গোপনে জুতোর মধ্যে বিছা রেখে দিতেন। ব্রাহ্মণেরা যেমনি দান পেয়ে মনের আহ্লাদে জুতো পায়ে পরতেন, আর

অমন বিছের কামড়ে ছুঁফুঁ করে টেঁচিয়ে উঠতেন, আনন্দের বদলে
চোখ দিয়ে বার বার ক'রে জল পড়তে থাকতো।

অমন মায়ের অমন পাপিষ্ঠ ছেলে ! অহল্যা বাঈ পুত্রের ব্যবহারে



মর্শ্বে মর্শ্বে দারুণ
আঘাত পেলেন।
ঠাকুর দেবতার চরণে
তিনি দিনরাত কেঁদে
কেঁদে প্রার্থনা করতেন
—“ঠাকুর, পুত্রকে
আমার স্মৃতি দাও।”
তিনি নিজে মাল-
রাওকে ভাল হবার
জন্য কত উপদেশ
দিতেন, কিন্তু কিছুতেই
কিছু হ'লো না।
নিষ্ঠুরতা তাঁর দিন
দিন বেড়েই চলতে
লাগলো। কোন রকম
পাপ কাজ আর তাঁর
করতে বাকি রইলো
না।

ঐ...প্রতিশোধ নিতে আসছে।—১৭ পৃষ্ঠা

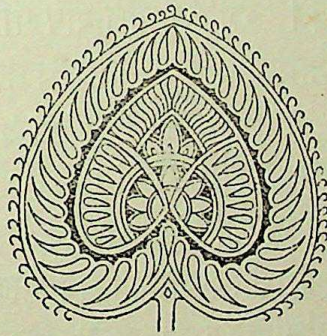
অবশেষে তাঁর এই পাপের সাজার দিন ঘনিয়ে এলো। তিনি
একদিন একজন শিল্পীর বিনা অপরাধে মাথা কেটে ফেলবার হুকুম
দিলেন। শিল্পী কত কাকুতি মিনতি জানিয়ে প্রাণভিক্ষা চাইলো,

কিন্তু মালেরাও-এর মন কিছুতেই নরম হ'লো না । মৃত্যু-সময়ে শিল্পী বলতে বলতে মরলো,—“মরেও আমি আমার এই অগ্নায় মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবো, মালেরাও তুমি দেখো ।”

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই মালেরাও কেবল ভয়ে চম্কে চম্কে উঠতো আর বলতো, “ঐ সে তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে আসছে ।” সে দেখতে পেতো, সেই শিল্পীর ভীষণ প্রেতাত্মা যেন তাকে কেবল তেড়ে তেড়ে আসছে, আর দ্রুত ক'রে বলছে—“দাঁড়াও, প্রতিশোধ !”

এল্লি ক'রে ক'রে সে পাগল হ'য়ে গেল । কত চিকিৎসা হ'লো, অহল্যা কত অর্থ ব্যয় করলেন, কত ঠাকুর দেবতাকে ডাকলেন,—কিছুই হ'লো না । মালেরাও মারা গেলেন ।

পুত্রশোক অহল্যার বুকে ভীষণ বজ্রের মত এসে পড়লো । কিন্তু নিজকে সাত্বনা দিয়ে তিনি সুস্থির করলেন,—অমন পুত্র ম'রে ভালই হ'য়েছে, তা' না হ'লে রাজ্যের কি ভীষণ অবস্থা হ'তো—কে জানে ?



সাত

পুত্রশোক সামলিয়ে নিয়ে অহল্যা আবার রাজ্যশাসনে মন দিলেন ।
দান-ধ্যান, ব্রতপার্বণ রীতিমতই চলতে লাগলো ।

ইন্দোরের রাজকোষে বহু টাকা সঞ্চিত আছে শু'নে রাঘোবা দাদা নামক একজন পাপিষ্ঠ লোভী ব্রাহ্মণ অহল্যা বাসি-এর যশোবন্ত গঙ্গাধর নামক একজন কৰ্মচারীর সঙ্গে যোগ দিয়ে সে টাকার কিছু আত্মসাৎ করবার মতলব করলেন । সে ষড়যন্ত্র অহল্যার কাছে অজ্ঞাত রইল না ।

রাঘোবা দাদা অহল্যা বাসিকে একথানা চিঠি লিখলেন,—“তোমার রাজকোষে বহু অর্থ সঞ্চিত রয়েছে, আমার কিছু টাকার দরকার, অবিলম্বে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেবে ।”

এই পত্র পেয়ে অহল্যা রাগে জ্ব'লে উঠলেন । তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন,—“ইন্দোর-রাজকোষে যে অর্থ আছে, আমি তা' দানধৰ্ম্মে ব্যয় করবো মনস্থ করেছি । তা' আপনি যদি দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশে এসে হাত পেতে দাঁড়ান তবে আপনাকে কিছু দান করতে পারি ।”

পত্র পেয়ে রাঘোবা দাদা অপমানে জ্ব'লে পু'ড়ে উঠলেন । কি, একজন স্ত্রীলোকের এতদূর স্বর্দ্ধার কথা ! তিনি উত্তর দিলেন,—
“শীঘ্রই যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার এ অহঙ্কার চূর্ণ করছি ।”

অহল্যা বাসি বীর রমণী, রাঘোবার এ ধমকানোতে তিনি একটুও ভয় পেলেন না । সেনাপতিকে আদেশ দিলেন, সৈন্য সাজাও । ইন্দোর রাজ্যে যুদ্ধের সাড়া পড়ে গেল ।

অগাধ রাজারাও রাঘোবা দাদার এত বড় নীচতার কথা শুনে

অসন্তুষ্ট হ'য়ে অহল্যা বাঈকে সাহায্য করার জন্য সৈন্য পাঠালেন।
রণ-দামামা বেজে উঠলো।



“সৈন্য সাজাও।”— ১৮ পৃষ্ঠা

অহল্যা বাঈ ঘরে ব'সে রইলেন না। তিনি যুদ্ধের সাজে সেজে
ধনুর্ঝাণ নিয়ে হাতীতে চড়ে যুদ্ধ করতে চল্লেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শত
শত নারী যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়ে খোলা তলোয়ার হাতে যাত্রা করলো।

সূর্যের কিরণে তাদের তলোয়ারে তলোয়ারে যেন বিদ্যুৎ ঝলসাতে লাগলো !

অহল্যা বাঈ রাঘোবা দাদাকে ব'লে পাঠালেন,—“আমাদের সঙ্গে আগে যুদ্ধ কর, তারপর পুরুষ সৈন্যদের সঙ্গে লড়বে।”

রাঘোবা দাদার সৈন্যেরা স্ত্রীলোক দেখে সব বঁকে বসলো,— স্ত্রীলোকের উপর তারা কিছুতেই অস্ত্র ধরতে পারবে না। রাঘোবা দাদা দেখলেন মহা বিপদ, তাই তিনি যুদ্ধ না ক'রেই মানে মানে বিদায় হ'লেন।

যুদ্ধের গোলমাল মিটে গেল। অহল্যা আবার রাজ্যশাসন এবং দানধ্যান ও ব্রত-পার্বণে মন দিলেন।



আট

অহল্যা প্রাণপণে ন্যায়বিচার করতে চেষ্টা করতেন। তাঁর জ্ঞাতসারে কোনো রকম অত্যাচার কাজ কিছু হওয়ার যো ছিল না।

একবার তাঁর রাজ্যে এক বণিক বিপুল ধন-সম্পত্তি রেখে মারা যান। তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল না। বণিকের স্ত্রী একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করলেন। অহল্যার একজন কর্মচারী দেখলেন, এই পোষ্য গ্রহণ ব্যাপারে রাজকোষের বেশ একটা মোটা আয় হ'তে পারে। ততগুলো টাকা রাজকোষের আয় বাড়িয়ে দিতে পারলে, মহারাণীর কাছে তিনি প্রশংসাও পাবেন যথেষ্ট, চাকরীরও উন্নতির খুব সম্ভাবনা। তাই তিনি বণিকের স্ত্রীর উপর হুকুমজারি করলেন,—“তিন লক্ষ টাকা রাজসরকারে জমা না দিলে, পোষ্য গ্রহণ করতে পারবে না।”

কথাটা ক্রমে অহল্যা বাঈ-এর কাণে এলো। তিনি তৎক্ষণাৎ কর্মচারীকে ডাকিয়ে খুব ভৎসনা ক'রে বলেন,—“শাস্ত্রানুসারে বণিকের স্ত্রী পোষ্য নিচ্ছে, এতে আবার রাজকোষে টাকা দিতে হবে কেন? ও রকম অত্যাচার ভাবে টাকা আদায়ের কোনো দরকার নাই।”

নিজের প্রশংসা শুনতে সকলেই ভালবাসে। কিন্তু অহল্যা বাঈ সে ধাঁচের ছিলেন না। তিনি আত্মপ্রশংসা শুনতে মোটেই ভালবাসতেন না। একবার এক ব্রাহ্মণ পুরস্কারের লোভে অহল্যার প্রশংসা ক'রে একখানা বই লিখে নিয়ে এলেন। বইখানা আগাগোড়া তাঁর কাছে পড়া হ'লো। তিনি বইখানা ব্রাহ্মণের নিকট থেকে নিয়ে নরখদার জলে ফেলে দিয়ে বলেন, “আমি সামান্য একজন স্ত্রীলোক, আমার মধ্যে অত প্রশংসার কিছুই নাই। আপনি এক্ষুণি এখান থেকে চ'লে যান।” ব্রাহ্মণ আশু আশু স'রে পড়লেন।

নয়

আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই, বড়লোকেরা প্রায়ই বড় আরাগপ্রিয় হ'য়ে থাকেন। নিজেরা কোনো কাজকর্ম বড় একটা করতে চান না। কিন্তু ইন্দোর-রাজ্যের মহারাণী অহল্যা বাঈ-এর জীবন সম্পূর্ণ অন্য রকমের।

অতি প্রত্যুষে গাছে গাছে পাখীর প্রথম কলরবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘুম থেকে উঠে স্নান এবং সন্ধ্যাপূজা শেষ ক'রে মহাভারত পড়তে বসতেন। প্রভাতেই শত শত অন্ধ আতুর ভিক্ষার আশায় এসে রাজবাড়ীর ছয়ারে জমা হ'তো। অহল্যা নিজ হাতে তাদের সকলকে দান করতেন। তারপর ব্রাহ্মণদের দান এবং ভোজন আরম্ভ হ'তো। ব্রাহ্মণভোজন শেষ হ'লে তিনি বহুস্ত নিজের জন্ম সামান্য কিছু রুঁধে আহাৰ করতেন। আহাৰের পরেই রাজসভায় গিয়ে ব'সে রাজকার্য্য দেখতেন। সেখানেই প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে যেতো। তারপর আবার ছ'তিন ঘণ্টা সন্ধ্যা-আহ্নিক জপতপ ক'রে পুনরায় রাজকার্য্যে বসতেন। রাত প্রায় এগারোটার সময় সমস্ত কাজ শেষ ক'রে সামান্য কিছু জলযোগের পর নিদ্রা যেতেন। এম্মি ভাবে তাঁর সারাটা জীবন চলেছিল।

নানা রকম সংকাজ এবং দানের জন্ম আজ অহল্যা বাঈ চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছেন। জীবনে তিনি এত টাকা দান ক'রে গেছেন যে, তার সংখ্যা হয় না। রাজ্যের সমুদয় খরচ বাদে যে টাকা বাঁচতো, অহল্যা বাঈ সে সমস্ত একত্র ক'রে তুলসীপাতা এবং গঙ্গাজল দিয়ে তার উপর মন্ত্র পড়ে ধর্ম্মকার্য্যের জন্ম উৎসর্গ ক'রে রাখতেন। তারপর

সেই টাকা দেবমন্দির নির্মাণ, রাস্তা প্রস্তুত, জলাশয় খনন, পান্থশালা ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা, অন্নসত্র স্থাপন, নদীতে ঘাট নির্মাণ ইত্যাদি নানাবিধ সংকার্যে ব্যয় করতেন।

কালীধামের বিষ্ণুনাথের মন্দির এবং গয়ার শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মের মন্দির পুণ্যবতী অহল্যা বাঈ-এরই কীর্তি। জগন্নাথতীর্থে যাওয়ার জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে একটি রাজপথ নির্মাণ করিয়েছিলেন, সে পথের চিহ্ন আজও দেখতে পাওয়া যায়। গঙ্গা থেকে দাক্ষিণাত্য অনেক দূরে, সেখানে যে সব দেববিগ্রহ আছেন, তাঁদের গঙ্গাজলে স্নান করাবার জন্য প্রতিদিন গঙ্গা থেকে জল নেওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। কালীতে গঙ্গায় অহল্যা বাঈ-এর ঘাট এখনো বর্তমান রয়েছে।

সারাজীবনে তিনি নাকি কুড়ি কোটি টাকারও বেশী দানধ্যানে ব্যয় করেছিলেন। হিন্দু মুসলমান সকলকেই তিনি সমান ভাবে দান করতেন। প্রতিদিন শত শত দরিদ্র তাঁর অন্নসত্রে আহার করতো। শীতকালে গরীব-দুঃখীদের তিনি গরম কাপড় কিনে দিতেন।

শুধু কি কেবল মানুষের জন্যই এই দয়াবতী নারীর প্রাণ কঁদেছিল ? তা নয়। পশুপক্ষীদের জন্যও অহল্যার যথেষ্ট দানের পরিচয় পাওয়া যায়।

পাখীদের খাওয়ার জন্য তিনি মাঠের ও ক্ষেতের মাঝে মাঝে নানা রকম শস্য রেখে দিতেন। পাখীরা পেট ভরে খেয়ে মনের আনন্দে আকাশ ছাপিয়ে তাঁর জয়গান করতে করতে দিগ্দিগন্তে উড়ে চলে যেতো। মাছের খাওয়ার জন্য অহল্যা নর্মদার জলে ময়দা, ছাতু ইত্যাদি ফেলে দিতেন।

তীর্থভ্রমণে যাওয়ার সময় তিনি নানা রকম ফলের বীজ সঙ্গে নিয়ে যেতেন। যেখানে দেখতেন গাছপালা কিছুই নেই, কেবল ধূ ধূ করছে মাঠ, সে সমস্ত জায়গায় এবং পথের ধারে ধারে বীজ পুঁতে দিতেন।

গাছ বড় হ'য়ে পথিকদের ছায়া দেবে এবং পাখীরা তাদের ফল খেয়ে ও ডালে বাসা বেঁধে সুখে বাস করবে—এই ছিল অহল্যার উদ্দেশ্য।

নরমদার তীরে মহেশ্বরক্ষেত্র নামে একটি গ্রামে পূজা ও ব্রতপার্বণ করার জন্য অহল্যা মাঝে মাঝে গিয়ে বাস করতেন। কৃষক এবং রাখালেরা যখন গরু এবং মেষগুলোকে নিয়ে বাড়ী ফিরতো, তখন সেগুলোকে জল খাওয়াবার জন্য অহল্যা বাঈ দাসীদের সঙ্গে জলভরা কলসী নিয়ে পথে দাঁড়িয়ে থাকতেন—এমনি ছিল দয়াবতী অহল্যার সর্বস্বজীবের প্রতি সমভাবে করুণা।

নানা শোকে ছুগে এবং রাজ্য পরিচালনের কঠোর পরিশ্রমে তাঁর শরীর ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়ছিল। কিন্তু সেদিকে তাঁর মোটেই লক্ষ্য ছিল না। সেই ভাঙ্গা শরীর নিয়েও ব্রত উপবাসের এবং রাজকার্য্য দেখাশুনার বিরাম ছিল না।

মৃত্যুর অল্পদিন আগে তিনি 'মুক্তদ্বার' অন্নসত্র খুলেছিলেন এবং রাজ সহস্র ব্রাহ্মণভোজন এবং অন্ধ-আতুরদের কাপড় বিতরণ করতেন। যেদিন তাঁর মৃত্যু হয়, সেদিন বার হাজার ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

অহল্যা বাঈ ত্রিশ বৎসর ইন্দোর রাজ্য পরিচালন করে পোশ্চপুর তুকাজী হোলকারের হাতে রাজ্য সমর্পণ ক'রে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তুকাজীর বংশধরেরা আজও ইন্দোর রাজ্য ভোগ করছেন।

শেষ

ছেলেমেয়েদের উপহার দিবার মত কতকগুলি বই

জীবনীকথা		ছায়া ও কায়া	১১
জর্জ বার্নার্ড শ*	১১	বাসুকীর অভিশাপ	১১
বিপ্লবী ষ্টালিন	১১	কৃষ্ণার অভিশান	১১০
সত্যেন্দ্রনাথ বাপুজী	২১	অভিশপ্ত ম্যামী	১১
রাষ্ট্রনেতা জওহরলাল	১	নিরুপম রাতের কান্না	১১
নাটক		বোম্বেটে দ্বীপ	১১
সিপাহী বিদ্রোহ (ছেলেদের জন্য)	১১	ঘোরপ্যাঁচ	১১
বুড়ি বাল্যামের ভীষ্ম	১১	সুন্দরবনের গুপ্তধন	১১০
কেদার রায়	১১০	বাঘরাজ্যের অভিশান	২১
শিবারাজী	১১০	আলোর আলো	১১
পূজাবার্ষিকা		অন্ধকূপের বন্দী	১১
বসুধারা	৪১	কৃষ্ণার পরিচয়	১১০
পরশমর্নি	৪১	পেশোয়ারের বিভীষিকা	১১
জ্ঞানের বই		ছোটদের রমেশ দত্ত সিরিজ	
অতীতের পৃথিবী	১১০	মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত	১১
বিত্তানের যুগান্তর	৫০	রাজপুত জীবনসম্রাট	১১
বিত্তান-জগৎ	৫০	ছোটদের বন্ধি ও দাণ্ডার গ্রন্থাবলী	
বিত্তানের মায়াজাল	১১	যুগলাঙ্গুরীয়	১১
ব্যায়াম বিষয়		নবাবনন্দিনী	১১
ছোটদের খেলা ও ব্যায়াম	১১০	তিলোত্তমা	১১
বলীদের গল্প	১১০	বিষমুগ্ধ	১১
ভ্রমণ কথা		মৃন্ময়ী	১১
দুর্গমের বিভীষিকা	১১	পাঁচশিশালী	
কম্যাণ্ডার কবুতর	১১০	আলো দিয়ে গেল যারা	২১
আকাশ গঙ্গা	১১০	ছোটদের পদ্মাপুরাণ	২১
জন্তু-জানোয়ার সম্বন্ধীয়		রঙীন আকাশ	২১
পাতালপুরের দ্বিধিজয়ী	১১	জন্মদিনের উপহার	২১
জীবজগতের আজব কথা	১১০	ভুতুড়ে কাণ্ড	
অনুবাদ সিরিজ		অদ্ভুত ষত ভূতের গল্প	২১
ক্যুরোভাদিস্	১১০	ঠাকুরমার ঝুলি	৩১
আঙ্কল টমস্ কেবিন	১১০	ভূত প্রেত দত্তি দানা	১১০
কাউন্ট অফ মণ্টেক্রিষ্টো	১১০		